OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 351 - 358
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 351 - 358
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

গল্পে ইতিহাস, ইতিহাসে গল্প : প্রমথনাথ বিশীর রচনায় ঐতিহাসিক চেতনা

অনুপমা বালা সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নাদিয়া
Email ID: anupamabeng22@klyuniv.ac.in

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Bengali literature, Promothnath Bishī, politics, society, history, culture, psychology.

Abstract
One of the most well-known names in Bengali literature is Promothnath Bishī. In addition to writing essays, plays, and novels, he made a significant contribution to the field of short tales. A distinctive synthesis of politics, society, history, culture, and psychology could be found in his literary works. He added a distinctive element to Bengali literature's historical fiction heritage. His historical fiction serves as a means of understanding a specific era, culture, character, and age in addition to being a source of literary enjoyment.

Through an analysis of a few historical short stories, this essay will try to comprehend his historical consciousness, the impact of imagination, intentions, and his inquisitive approach to the human mind. Following Sharadindu Bandyopadhyay and Bankimchandra Chattopadhyay, Promoth nath Bishī contributed a unique perspective to the historical fiction genre. History is not only a backdrop in the short stories of his kind but rather it serves as a vehicle for exposing character psychology, self-criticism, and societal and personal crises.

He never condoned social or personal injustice. Through satire and irony, he boldly voiced his protest against all wrongs. His historical short stories, however, showed an attempt to uphold traditional practices. This essay will seek to highlight his historical awareness, creative uniqueness and significance, through a study of his (selected) historical short stories.

Discussion

মানব সভ্যতার বিকাশ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবরণ দেয় ইতিহাস। তবে ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনার বিবরণ দেয়না, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা প্রদান করে, সঠিক পথ দেখায়। এই দিক থেকে ইতিহাসকে মানুষের

আত্মপরিচয় গঠনের একটি মাধ্যম বললেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানব সভ্যতার নানা দিক যেমন সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পালাবদল, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, মূল্যবোধের অবক্ষয় এই সমস্ত কিছুর স্পষ্ট চিত্র ধরা পড়ে ইতিহাসের পাতায়। অনেকসময় সাহিত্য ইতিহাসের এই প্রবাহমান ধারা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, তাতে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পসম্মত রূপদান করে। তথ্যনির্ভর ইতিহাসকে রসে জারিত করে নবরূপে উপস্থাপন করেন সাহিত্যিকরা। ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করে সাহিত্য রচনার ধাপ বহুদিন থেকেই চলে আসছে। তবে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্পে অতীতকে নব উপস্থাপন করেছেন সাহিত্য স্রষ্টারা।

কথা সাহিত্যের কনিষ্ঠ সন্তান ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্পের পথচলা শুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষভাগে। জীবনের বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে ছোটগল্পের রূপ দেওয়া হয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে, স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের গভীরতর সত্যকে উপস্থাপন করা হয়। ছোটগল্পের বেশ কয়েকটি শাখার মধ্যে একটি হল ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্প। এই ইতিহাস নির্ভর ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী প্রমথনাথ বিশী, তিনি ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে অসাধারণ সব ছোটগল্প রচনা করে ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী প্রমথনাথ বিশী (১৯০১ - ১৯৮৫) ছিলেন রবীন্দ্র গবেষক, শিক্ষক, প্রবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যচর্চার পরিসর বৃহৎ ও বৈচিত্রপূর্ণ। তাঁর ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র সরাসরিভাবে উঠে আসতে দেখা যায়। ইতিহাস কেবলমাত্র পটভূমি হিসেবে উপস্থিত না থেকে গল্পের মূল কাহিনি ও চরিত্রদের অগ্রগতি ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, শোষক শ্রেণির হিংস্র স্বরূপ যেমন তিনি তুলে ধরেছেন, তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, নৈতিক দ্বন্দ্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রমথনাথ বিশীর ইতিহাস আশ্রিত ছোটোগল্পগুলিতে প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারতের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ ধরা পড়েছে। একথা বলা যেতে পারে যে পরিবর্তিত সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার মানচিত্র ধরা পড়েছে প্রমথনাথ বিশীর ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে। তাঁর ‘মহেন-জো-দড়োর পতন’, ‘জমিগ্রীনের আত্মকথা’, ‘কোকিল’, ‘ছিন্নদলিল’, ‘গুলাব সিং-এর পিস্তল’, ‘মৌলাবক্স’ এই গল্পগুলিতে শুষ্ক ইতিহাস কল্পনার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন মহানগর মহেঞ্জোদারোকে কেন্দ্র করে ‘মহেন-জো-দড়োর পতন’ গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সিন্ধু নদের বন্যা ও আর্য জাতির আক্রমণ থেকে নগর রক্ষার জন্য পূর্তসচিব ও সেনাধ্যক্ষর আত্মত্যাগ। গল্পের শুরুতেই দুই প্রধান ব্যক্তিকে দেখা যায় সিন্ধু নদের বাঁধের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে। এদের মধ্যে একজন মহেঞ্জোদারো নগরের পূর্তসচিব, অন্যজন সেনাধ্যক্ষ। এই দুই ব্যক্তির পাশে পাঠকদের দাঁড় করিয়ে দিলেন গল্পকার, তাঁর ভাষায়—

> “তাহাদের নিকট দাঁড়াইলে পূর্বদিকে মুখ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ আবার পশ্চিমদিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবত সৌধতরঙ্গ দূরে বলিয়া, নীচে বলিয়া দাবার ছকের মত দৃশ্যমান তিনতলা বাড়িগুলোও খেলাঘরের মতো।”[১]

লেখকের রচনা কৌশলের সুবাদে সুপ্রাচীন ঐশ্বর্যশালী মহেঞ্জোদারো নগর ভ্রমণ করতে পারলো পাঠকরা।

বর্ষার শুরুতেই নদীর জল বাঁধের কিছুটা অংশ গ্রাস করে নিয়েছে। তাছাড়া কয়েক বছর পর পর ভয়ংকর বন্যা হয়। এই সময়ে বাঁধ মেরামত করা অত্যন্ত অবশ্যক। ভীত সন্ত্রস্ত সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত সচিব আসন্ন বিপদের কথা বলে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করে নগরবাসী, রাজপুরুষদেরকে। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্তসচিবের কথায় গুরুত্ব দেয় না নবীন রাজপুরুষগণ। এই সময় গুপ্তচরেরা জানায় একদল মহাশক্তিশালী আততায়ীরা নগর আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। তাদের বাহন দ্রুতগামী কোনো জন্তু, এই জন্তু নগরবাসীর অচেনা। এই বিপদের কথা জানানোর জন্য সভা বসে। এই সভায় সেনাধ্যক্ষ বলে —

> "নতুন যে দুর্ধর্ষ জাতি সুদূর উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এইরূপ দ্রুতগতি বাহনের জন্যই তারা অজেয়।"[২]

নগরবাসীর জন্যে বাঁধ মেরামতের প্রস্তাব দেয় পূর্তসচিব, সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু তাদের উপেক্ষা করে স্নানগার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজপুরুষগণ। অলস রাজপুরুষগণ বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপনে মগ্ন হয়ে পড়ে। এইভাবেই কেটে যায় তিন বছর। চতুর্থ বছরেই অশ্বারোহী আক্রমণকারীরা উপস্থিত হয় নগর সীমান্তে। প্রশস্ত, ললাট ও গৌর বর্ণের এই অশ্বারোহীরাই আর্যজাতি। রাজপুরুষগণ ধনরত্ন উপহার দিয়ে এবারের মত নগরকে রক্ষা করে। এর কয়েক বছর পর পুনরায় শত্রুরা নগরে প্রবেশ করার মুহূর্তেই বাঁধ ভেঙে ফেলা হয় পূর্ত সচিবের আদেশে। জলের আঘাতে প্রথমেই ভেসে যায় পূর্তসচিব। তাদের এই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় আরডি ব্যানার্জী মহেঞ্জোদাড়ো নগর আবিষ্কার করেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এই নগরের ধ্বংসের অনেকগুলি কারণের মধ্যে দুটি কারণ হল- আর্য আগমন, ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বন্যা)। এই ঐতিহাসিক কারণ দুটিকে অবলম্বন করে 'মহেন-জো-দড়োর পতন'-এর কাহিনি নির্মিত হয়েছে। এর সঙ্গে আরেকটি কারণ গল্পকার জুড়ে দিয়েছেন, সেটি হল রাজপুরুষগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিলাসপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন।

এই গল্পে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রদের দেখা যায়নি। পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ এই প্রধান চরিত্র দুটি লেখকের কল্পনার ফসল। জন্মভূমি রক্ষা করার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের মধ্যে নগর রক্ষা করার যে তাগিদ দেখা যে সমগ্র গল্প জুড়ে, আসলে তা লেখকের আকাঙ্খা। প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন স্থাপত্যকে সংরক্ষণ করার জন্য কাল্পনিক চরিত্র দুটি সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। গল্পের শুরুতেই পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের বেশভুষার বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার।

> "দুজন লোকই দীর্ঘকায়, একজনের দাড়ি, গোঁফ দীর্ঘ, আর একজনের গোঁফ ছোটো করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাঁড়ি দীর্ঘ; দুজনেরই চুল লম্বা - সে চুল পিছনের দিকে খোপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কঙ্কতিকা (কাঁকই) গোঁজা; বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, অধোবাস অদৃশ্য।"[৩]

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন জানা যায়, তেমনি অতীত আবহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহ্যময় মহেঞ্জোদারো নগর, বিখ্যাত স্নানগারের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক —

> "পাঠক এই নগরীর নাম মহেন-জো-দাড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচ হাজার বছর আগেরকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতেপূর্ণ জীবন চঞ্চল নগর। মহেন-জো-দাড়োর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস, একটি স্নানাগার। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭/৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত।"[৪]

এই বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে, এছাড়া চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। আর্যদের ঘোড়া ব্যবহার ও ভারত আক্রমণের প্রসঙ্গটির মিল রয়েছে ইতিহাসের সঙ্গে। এই গল্পে ইতিহাসের প্রভাব বেশি। লেখক নিজেই এই সত্য স্বীকার করে বলেছেন—

> "এই গল্প রচনায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয় তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।"[৫]

সমগ্র গল্পটিতে ঐতিহাসিক রস পরিবেশিত হয়েছে। কল্পনার অধিক্য কম হলেও কাল্পনিক চরিত্রদুটির (সেনাধ্যক্ষ, পূর্তসচিব) প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে বেশ কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন তার মধ্যে একটি 'জেমিগ্রীনের আত্মকথা'। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সিপাহী বিদ্রোহকালীন সময়। কালপর্ব ১৮৫৭-৫৮ এর মধ্যবর্তী কোনো সময়। কাহিনি শুরু হয়েছে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। লক্ষ্ণৌ তখন সিপাহীদের অধিকারে। লক্ষ্ণৌ দখলের উদ্দেশ্যে কলিন ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যাত্রা করেছে। যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশদের সেনাদের তাঁবু পড়েছে। উনাও শহরেও ব্রিটিশ

সেনাদের তাঁবু পড়ে। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান করে ফরবেস মিচেল। খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সেনা ছাউনিতে আসে জেমি গ্রীন। ফরবেস মিচেলের সঙ্গে এখানেই পরিচয় হয় জেমিগ্রীনের। গ্রীন অসাধারণ ইংরেজি বলতে পারে। গ্রীন তার আসল পরিচয় লুকিয়ে নিজেকে খানসামা বলে পরিচয় দেয়। কথা বলার মাঝে ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে চোখ বুলিয়ে নেয় সে। এই সময় গ্রীনের সহচর মিকি ধরা পড়ে। গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করা হয় তাদের। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি শোনানো হয়। বিধর্মী গ্রীন ও মিকির ধর্মনাশ করার চেষ্টা করে ব্রিটিশ সেনা। এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে ফরবেস মিচেল। বলে—

> “যে ওরকম অসভ্যতা করবে তার চাপরাশ উর্দি খসিয়ে নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।”[৬]

অত্যাচারের হাত থেকে মৃত্যুপথীযাত্রীদের রক্ষা করে ফরবেস মিচেল।

গ্রীন মিচেলের মানবিক আরচনে মুগ্ধ হয়। আরেক জন ইংরেজের কথা গ্রীনের মনে পড়ে সে হল নেপিয়ার। ফরবেস মিচেলকে গ্রীন তার বিদ্রোহের কারণ বলতে শুরু করে। সে জানায় তার প্রকৃত নাম মহম্মদ আলি খাঁ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান জেমি গ্রীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফার্স্ট হয়। কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পদে নিযুক্ত হয়। কিন্তু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার মূল্য দেয়নি ব্রিটিশরা। অপানিত, ক্ষুধা গ্রীন সিপাহীদের পাশে যোগদান করে। তবে সে গোয়েন্দা নয়। গ্রীন বলে ইংরেজদের এদেশ পরিত্যাগের কারণ হবে পাশ্চাত্য শিক্ষা। এরপর গ্রীন ফরবেস মিচেলকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আংটি দেয়। পরবর্তী কালে এই আংটির দৌলতে প্রাণে বেঁচে যায় ফরবেস মিচেল।

এই গল্পের উপাদান গৃহীত হয়ে ফরবেস মিচেল রচিত (Reminiseens of the great Mutiny) গ্রন্থ থেকে। কলিন ক্যাম্পবেল, ফরবেস মিচেল, জেমিগ্রীন (মহম্মদ আলি খাঁ) এই ঐতিহাসিক চরিত্রদের দেখা গেল। জেমি গ্রীন এখানে বঞ্চিত ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অধিকারী ব্রিটিশরা ভারতীয়দের তুচ্ছ জ্ঞান করত। উচ্চশিক্ষিত, যোগ্য ভারতীয়দের বঞ্চিত করা হত তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। এই সত্য তুলে ধরেছেন প্রমথনাথ বিশী আলোচ্য ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ভারতীয়দের স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের একটি কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী নিজেদের অধিকারের জন্য বিদ্রোহ করবেই লেখক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রীন কে বলতে শোনা যায় –

> “কোম্পানির শাসন চলবে যখন ইংরেজি শিক্ষিত দেশীলোক বিদ্রোহ করে বসবে।”[৭]

এই দিকটি ছাড়াও ঔপনিবেশিক ভারতে ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের নির্মম অত্যাচারের প্রতিচ্ছবিও ধরা পড়েছে উক্ত গল্পে।

মিচেলের বক্তব্য থেকে জানা যায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর চারপাশে ভারতীয় গোয়েন্দা ঘোরাফেরা করে। নিকটবর্তী গাছগুলিতে ভারতীয়দের মৃতদেহ ঝুলে থাকে। সত্যের পূজারী প্রমথনাথ বিশী অন্যায়কে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেননি। তাইতো ইংরেজদের সঙ্গে সিপাহীদের নৃশংসাতাকেও নিন্দা করেছেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন প্রমথনাথ বিশী।

এই গল্পটিতে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, সিপাহী বিদ্রোহের রাজনীতি, নৃশংসতা, অরাজকতার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। ইতিহাসের অনুগত থেকে কাহিনি পরিবেশন করেছেন। ঐতিহাসিক রসের সঙ্গে অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন গল্পকার।

প্রমথনাথ বিশী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপকে তুলে ধরেছেন ঠিকই একই সঙ্গে নর নারীর প্রেম, রোমান্টিকতাকে চিত্রিত করেছেন তাঁর ‘কোকিল’ গল্পে। গল্পের পটভূমি সিপাহী বিদ্রোহ। কালপর্ব ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। সিপাহীদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে বন্দুক, কামান। এই সেনাবাহিনীর দুইজন ব্যক্তি বিউস ও প্যালিসার কিছুক্ষণের জন্যে আম্র কাননে বিশ্রাম নেয়। এই সময় তারা কোকিলের কুহু ধ্বনি শুনতে পায়। আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা সত্বেও বিউস, প্যালিসার হারিয়ে যায় রোমান্টিক জগতে। তাদের মনে পড়ে স্বদেশের কথা। কিছু সময়ের জন্য তারা ভুলে যায় যুদ্ধের কথা। কবিতার শরণাপন্ন হয় তারা। এখন অনেকেই বলতে পারে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে কবিত্ব আসে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিউস বলেছে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 351 - 358
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "যুদ্ধপূর্ব মুহূর্তে মানুষের যাবতীয় চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় এমন প্রখর ও স্পর্শ কাতর হইয়া ওঠে যে, পূর্বে অদৃষ্ট জগতের অনেক সৌন্দর্য, পূর্বে অবোধ্য জীবনের অনেক সত্য সহজগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।"[৮]

বিউসের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে জীবন স্পৃহা। কোকিলের সুমিষ্ট কুহুধ্বনি শ্রবণ করে জীবনের প্রতি টান অনুভব করে প্যালিসার, বিউস।

প্যালিসার, বিউস কিছুক্ষণের জন্য রোমান্টিক জগতে বিচরণ করে। কিন্তু হঠাৎ সেখানে জনের আগমন ঘটে। জন বলে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে হবে অবিলম্বে। জনের সূত্রধরে প্যালিসার, বিউস পুনরায় বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে। চিন্তাগ্রস্ত বিউস তার স্ত্রীর কথা ভাবতে থাকে। কেননা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র কানপুরে তার স্ত্রী বেরাতে যায় যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশ ও সিপাহী উভয়েই হিংস্র হয়ে ওঠে। লুটপাট, নির্বিচারে গণহত্যা করতে শুরু করে উভয়পক্ষ। বিউস, প্যালিসার সরকারি কর্মচারী ছিলো। যুদ্ধকালীন সময়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে তারা সেনাদলে নাম লেখায়। তারা কানপুর আক্রমণ করতে যাত্রা করে।

এই যাত্রাপথের মাঝেই একটি আম্রকাননে তারা বিশ্রাম করে। এখানে কোকিলের সুমিষ্ট সুরে তারা মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে। কিন্তু এই আম্রকানন পরিত্যাগের সময় একটি সুটকেস তারা দেখতে পায়। এই সুটকেসের মধ্যে বিউসের স্ত্রীর একটি ছবি পাওয়া যায়। এই ছবিটি দেখে বিউস আরও ভীত হয়ে পড়ে। কারণ সিপাহীরা সাধারণ ইংরেজ নরনারীদেরও নির্মমভাবে হত্যা করে, লুটপাট চালায়। এইসময়ও কোকিলটি পুনরায় ডেকে ওঠে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'কোকিল' গল্পের প্রেক্ষাপট সিপাহী বিদ্রোহ কালীন সময়। সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অরাজকতা, ব্রিটিশ ও সিপাহীদের বর্বরতার চিত্র ধরা পড়েছে আলোচ্য গল্পে। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত সময়কালকে তুলে ধরার পাশাপাশি রোমান্টিকতার জয় ঘোষণা করেছেন গল্পকার। যুদ্ধই কেবল একমাত্র সত্য নয়। প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বেঁচে থাকার লড়াই ও সত্যের আরেকটি রূপ। জীবনের রসদ হলো প্রেম। যুদ্ধ ধ্বংসের প্রতীক হলে; প্রেম সৃষ্টির প্রতীক। যুদ্ধ তো কেবলমাত্র ধ্বংস করতে জানে। কিন্তু প্রেম থেকে পুনরায় নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ সমগ্র মানবসভ্যতাকে বিনষ্ট করতে চাইলে, মানবসভ্যতার কবজ হয়ে ওঠে প্রেম, ভালোবাসা, মানবতা ইত্যাদি। এই গল্পের বিউস, প্যালিসার এই চরিত্রদুটির মধ্য দিয়ে প্রেম চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রেম চেতনার প্রতীক হলো কোকিল। এই গল্পে ঐতিহাসিক পরিমন্ডলেও রোমান্টিকতা বজায় থেকেছে।

মহাবিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন। শিক্ষিতদের একাংশ এই বিদ্রোহে কোনোভাবে সমর্থন জানায়নি। যদিও এর পিছনে কারণ ছিল। যাক সে বিষয়ে আলোচনা না করাই ভালো। এই শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের আরেক অংশ যারা নিজেদের স্বার্থের জন্যে সর্বদা ব্রিটিশদের অনুগত ছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অবলম্বন করে 'ছিন্ন দলিল' এর কাহিনি গড়ে উঠেছে 'Havelocks March on caunpore' (J. W. Sherar), এবং 'History of Indian Munity; Volumn' (By Charles Bul) এই দুটি গ্রন্থ থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন গল্পকার।

কাহিনির প্রারম্ভে দেখা যায় জেনেরাল হ্যাভলকের নেতৃত্বে কানপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে কানপুরে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় মিঃ শেরার। একদিন কানপুর পরিদর্শনে এসে একটি সরকারি বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় মিঃ শেরার। এই বাড়ি থেকে একদল লোক হাজির হয় শেরার নিকট। তারা প্রার্থনা জানায়—

> "ইয়োর অনার সেভ আস, হামলোগ লয়াল হ্যায়।"[৯]

এই প্রার্থনাকারীরা হলো প্রবাসী বঙ্গসন্তান। তারা সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশদের সমর্থন করেছিল। এই কারণে সিপাহীরা তাদের উপর ক্ষেপে ওঠে লুঠপাঠ চালায়। এই বঙ্গ সন্তানদের অভিযোগ সত্য ছিল ও সে সম্পর্কে অবগত মিঃ শেরার। কোলকাতা থেকে যে ব্রিটিশ সেনারা এসেছে তাদের নিকট থেকে মিঃ শেরার জানতে পারে যে সেখানকার শিক্ষিত যুবকেরা সিপাহীদের কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছে। অনেকে এই নিয়ে সাহিত্য রচনা করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বঙ্গ সন্তানের সুরক্ষার জন্যে মিঃ শেরার একটি চিঠিতে স্বাক্ষর। এই কাগজটিকে মুখুজ্জ্যে বাড়ুজ্জ্যেরা তাদের বাড়ির দরজাতে টানিয়ে রাখে।

এরপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পুনরায় কানপুর অধিকার করে। এরপর তারাও সিপাহীদের মতো হিংসাত্মক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে পড়ে। নির্বিচারে ভারতীয়দের হত্যা করতে শুরু করে। ঘর, বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এইরকম সংকটময় অবস্থায় মুখুজ্জ্যেদের বাড়িতে পঁচিশ বছরের এক যুবক আশ্রয় নেয়। এই যুবক নানা কথাচ্ছলে ইংরেজ পদলেহনকারী প্রবাসী বাঙালিদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চালায়। ঐ দিন মিঃ শেরার পুনরায় ঐ বাড়িটিতে আসে। কোনো সিপাহীর সন্ধান করতে থাকে শেরার। এরপরের দিন সকালে নবাগত ঐ যুবক পালিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় দরজায় টানানো কাগজটি ছিঁড়ে, নতুন কাগজ রেখে যায়। এই নতুন কাগজটিতে লেখা ছিল যে বাড়িতে সন্ত্রাসবাদীদের বাস। এই কাগজ দেখে মুখুজ্জ্যে বাড়ুজ্জ্যেরা বিপদের আশঙ্কায় কান্নাকাটি শুরু করে।

এই গল্পের প্রধান চরিত্রদের নাম উল্লেখ নেই। তারা চাটুজ্জে, বাড়ুয্যে, ঘোষ, মুখুজ্জে নামে পরিচিত। এই চরিত্র গুলি টাইপ চরিত্র। যার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এই ধরণের মানুষের অভাব ছিল না। এছাড়া মি. শেরার, জেনারেল হ্যাভেলক, জেনারেল নীল, এই ঐতিহাসিক চরিত্রের দেখা গেল। সিপাহীবিদ্রোহ কালীন সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধের ভয়াভয়তা, বর্বরতার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে ‘ছিন্ন দলিল’ গল্পে। ইংরেজ চাটুকারদের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আক্রমণ করেছেন, প্রমথনাথ বিশী। ঐতিহাসিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য চরিত্র ও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। তাইতো প্রবাসে কর্মরত বাঙালিরা হিন্দি, বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করেছেন প্রমথনাথ বিশী।

কোনো মহান আদর্শের জন্য যে মানুষ সব সময় রাজনীতি বা কোনো আন্দোলনে যোগ দেয় এমনটি নয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ববসত মানুষ কোনো আন্দোলনে জড়িয়ে পরে। সিপাহী বিদ্রোহেও এর অন্যথা ঘটেনি। এই বাস্তব সত্যকে রূপ দিয়েছেন প্রমথনাম বিশী তাঁর ‘গুলাব সিং-এর পিস্তল’ গল্পটিতে। এর উপাদান গৃহীত হয়েছে ‘Habelock’s march on cawnpore’ (J. W. Sherer) গ্রন্থ থেকে। মর্দান আলী ও গুলাব সিংয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাত এই গল্পের মূল বিষয়। তবে এর সঙ্গে জুড়ে আছে গোলাপ সিংয়ের রহস্যময় পিস্তলের কাহিনি।

গুর্জানপুর নিবাসী মর্দান আলী (থানাদার) ও গুলাব সিং বিত্তশালী আর্যবান এই দুই ব্যক্তি সর্বদা একে অপরকে আক্রমণ করে, বিবাদে লিপ্ত থাকে। এরই মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। সেই সময় প্রতাপশালী ব্যক্তিরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে; কেউবা স্বইচ্ছায়, আবার কেউ বা পরিস্থিতি গত কারণে। তারা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করতে চেয়েছিল। মর্দান আলি যোগ দেয় ব্রিটিশদের পাশে। আর গুলাব সিং যোগ দেয় সিপাহীদের দলে। সিপাহীদের প্রতাপ বাড়লে গুলাব সিং চড়াও হয় মর্দান আলির উপর। আবার একই ভাবে ব্রিটিশদের প্রভাব বাড়লে গুলাব সিংকে আক্রমণ করে মর্দান আলি। এরই মধ্যে কানপুর কখনও ব্রিটিশদের দখলে, আবার কখনও সিপাহীদের দখলে।

এইভাবে কেটে যায় একবছর। মহারানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন যে সিপাহী পক্ষের অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণা শোনা মাত্রই নিজের গ্রামে উপস্থিত হয় গুলাব সিং। সে বাড়ি ফিরে দেখে তার সম্পত্তি লুটপাট হয়ে গেছে। এই হীন কার্যে শত্রু মিত্র সকলেই যুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে মর্দান আলি গুলাব সিংকে আক্রমণ করে। একে অপরের অস্ত্রের আঘাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ যায়। এই ঘটনার পর সরকার গুলাব সিং এর পিস্তলটি সংগ্রহ করে নেয়। এর বেশ কয়েক বছর পর কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হয় টাকার সাহেব। ঐ পিস্তলসহ টাকার সাহেব স্বদেশে ফিরে যায়। সেখানে ঐ অভিশপ্ত পিস্তলের গুলিতে প্রাণ যায় টাকার সাহেবের ছেলের। এই পিস্তলের একটি ইতিহাস আছে, গুলাব সিং এর বংশ ছাড়া যার হাতেই এই পিস্তল গিয়েছে তাদেরই অকল্যাণ হয়েছে। পিস্তলের এই অভিশপ্ত কাহিনি জানতো টাকার সাহেব। তার এদেশ পরিত্যাগের পূর্বেই গুলাব সিং এর পুত্র পিস্তলটি ফিরিয়ে নিতে এসেছিলো। কিন্তু টাকার সাহেব তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। এর এক বছর যেতে না যেতেই এই পিস্তলের জন্য অকালে সে তার ছেলেকে হারায়। একটি চিঠি সহযোগে এই পিস্তলটি পাঠিয়ে দেয় কানপুরের নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট। টাকার সাহেব অনুরোধ করে গুলাব সিং এর বংশদের কাছে অভিশপ্ত পিস্তলটি ফিরিয়ে দিতে। এই গল্পের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি হল জেনারেল নীল, জেনারেল হুইলার, হ্যাভলোক প্রমুখ। তবে গল্পের প্রধান চরিত্র (মর্দান আলি, গুলাব সিং) গল্পকারের নিজস্ব সৃষ্টি।

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত এই গল্পের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহকালীন অস্থির পরিবেশ, রাজনীতি, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি দিকগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। গুলাব সিং এর সম্পত্তি লুটপাটের দৃশ্য প্রমান করে সেই সময়ের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছিল। ক্ষমতার লোভে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণে সুযোগসন্ধানী মানুষেরা যে কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে তারই জ্বলন্ত উদাহরণ মর্দান আলি, গুলাব সিং। এরা আসলে টাইপ চরিত্র, চিরকাল ধরেই এইধরণের স্বার্থান্বেষীরা সমাজ ও মানুষের মঙ্গলের জন্যে কোনো মহান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে না। তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যই তারা কোনো ছত্রতলায় আশ্রয় নেয়। সিপাহী বিদ্রোহেও এর অন্যথা ঘটেনি। এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন সত্যের পূজারী প্রমথনাথ বিশী।

১৮৫৮ খিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ লগ্নে দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহকে বন্দী করে; নির্বাসন দণ্ড দেয় ব্রিটিশরা। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 'মৌলাবক্স' এর কাহিনি গড়ে উঠেছে।

কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে করিম খাঁ, মৌলাবক্স (পাটহাতি)। এই মৌলাবক্স ছিল মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের পাটহাতি। কিন্ত কোম্পানি কর্তৃক বাহাদুর শাহের বন্দী দশায় মৌলাবক্সের স্থান হয় করিম খাঁর (মাহুত) বাড়িতে। করিমের অভাবের সংসারে মৌলাবক্সকে কেন্দ্র করে নিত্য কলহ বাঁধে করিমের (করিমের স্ত্রী) সঙ্গে। করিমের স্ত্রী মৌলাবক্সের বরাদ্দ খাবার থেকে খাদ্য শস্য লুকিয়ে রাখে হয়। সৎ বিবেকবান করিম তীব্র প্রতিবাদ করে জানায় যে, সে হীন কাজ করতে পারবে না। বাদশাহের শ্রেষ্ঠ হাতি মৌলাবক্স।

বাদশাহের শ্রেষ্ঠ হাতি ছিল মৌলবক্স। গৌরবময় যুগের প্রতিনিধি মৌলাবক্স। তাই পরিস্থিতি খারাপ হলেও করিম তার যত্নের খামতি রাখে না। মৌলাবক্সের রাজকীয় খাওয়ানোর মুহূর্তের সাক্ষী হয় শত শত মানুষ। এইভাবে দিন যায় মৌলাবক্সের। এরই মাঝে মহাবিদ্রোহ শুরু হয়। কোম্পানি কর্তৃক দিল্লি দখলের পর বাদশাকে নির্বাসনে পাঠায়। বাদশার এই দৈন্য দশা সহ্য করতে না পেরে আহার করা বন্ধ করে দেয় মৌলাবক্স। এছাড়া অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মৌলাবক্সকে বাঁচানোর তাগিদে করিম কোম্পানির বাহাদুরের শরণাপন্ন হয়। কোম্পানির বাহাদুর মৌলাবক্সকে কিনে নেয়। ভালো ভালো খাবারের প্রলোভন দেখালেও মৌলাবক্স ফিরেও তাকায়নি। বাদশার জন্যে অকাতরে অশ্রু বিসর্জন করে মৌলাবক্স। ব্রিটিশদের হাতে মৌলাবক্সকে তুলে দিতে চায় করিম। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে মৌলাবক্স মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। বাদশার পাটহাতির পরিচয়ে মৌলাবক্সের শেষ যাত্রা সম্পন্ন হয়।

'মৌলাবক্স' গল্পটিতে সিপাহী বিদ্রোহ, মোঘল সাম্রাজ্যের অবসান, ব্রিটিশদের শাসন ক্ষমতা দখল, আর্থিক সংকট, সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা প্রভৃতির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। মানবিক চেতনা সম্পন্ন মৌলাবক্সের করুন পরিণতি পাঠকের হৃদয় ব্যথিত করে। ব্রিটিশদের খাবার প্রত্যাখ্যান ও বাদশার পাটহাতি রূপেই মৌলাবক্সের মৃত্যুবরণ এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে বাদশার প্রতি মৌলাবক্সের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে এবং ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাল্পনিক এই কাহিনির মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর এই ঐতিহাসিক ছোটগল্পগুলিতে ঐতিহাসিক কথা সাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধি করেছে। তাঁর গল্পগুলিতে ইতিহাস কেবল অতীতের তথ্য নির্ভর নথি নয়। সমাজ ও ব্যক্তির অন্যায়, অপরাধ, শোষণের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছে। এরই সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, মনুষত্ব, সংকট এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সেতুবন্ধন করেছেন। জীবন ও মানবিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে হিসেবে ইতিহাসকে তিনি নির্বাচন করেছেন। ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে ইতিহাসের মধ্যে জীবনকে দেখেছেন প্রমথনাথ বিশী। প্রমথনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। প্রমথনাথ বিশী ইতিহাসের স্রোতে কল্পনাকে সঙ্গী করে নিয়েছেন। তবে তিনি কল্পনাকে অতিমাত্রায় ভরসা না করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের সামঞ্জস্য রেখে কাহিনি নির্মাণ করেছেন। একই সঙ্গে ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সৃষ্টিশীলতাকে রক্ষা করেছেন প্রমথনাথ বিশী।

প্রমথনাথ বিশী অসাধারণ প্রতিভাবলে ব্যক্তিজীবনের মাধ্যমে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করেছেন। ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। তাঁর এই চরিত্র নির্মাণ কৌশল ইতিহাসকে জীবন অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর ঐতিহাসিক ছোটগল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Reference:

১. বিশী, প্রমথনাথ, ঐতিহাসিক গল্প, করুণা প্রকাশিনী, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথমপ্রকাশ : বইমেলা, ২০২০
২. তদেব, পৃ. ৯
৩. তদেব, পৃ. ১৩
৪. তদেব, পৃ. ১৬
৫ তদেব, পৃ. ২৮
৬. তদেব, পৃ. ৪১
৭. তদেব, পৃ. ৪৩
৮. তদেব, পৃ. ৫০
৯. তদেব, পৃ. ৫৫

Bibliography:

বীরেন্দ্র দত্ত, ‘বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার’ মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭ – ২০১৮

প্রমথ চৌধুরী, ‘গল্পসমগ্র’, প্রথম সংস্করণ – ১৯৭০, বিশ্বভারতী

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, প্রণয় কুমার কুণ্ডু – প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১০, শ্যামচরণ দে স্ট্রিট কলিকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ৩০শে আগস্ট ২০০২

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা সাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা, মহিন্দর পুস্তক বিপনী, প্রথম প্রকাশ – নভেম্বর ১৯৯১

প্রমথনাথ বিশী, পুরোনো সেই দিনের কথা, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১০, শ্যামচরণ দে স্ট্রিট কলিকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১

বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৪০২

ভুদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার, মর্ডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬২

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মর্ডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, সপ্তম পুন মুদ্রন সংস্করণ - ১৯৮৪

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : অশ্বিন ১৩৯০